বিষয় : কোভিড পরিস্থিতি ও পরিযায়ী ভারতবর্ষ

"কোনও বিপর্যয়ই ছেলেদের আর মেয়েদের উপর একই প্রভাব ফেলে না"

কথাবার্তায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপিকা গোপা সামন্ত এবং মধুরিমা দত্ত

গোটা পৃথিবীতেই এক যুদ্ধ। নানা স্তরে নানা ভাবে যুদ্ধ। এক পক্ষের হাত থেকে ক্রমশ খসে যাচ্ছে ঢাল তলোয়ার। পা থেকে খসে যাচ্ছে চটি। পায়ে ধুলো লাগছে। ধুলোমহান পায়ে পায়ে চাকা ঘুরছে উলটো দিকে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার স্লোগান আমরা শুনেছিলাম বহু আগে। এখন শহর থেকে গ্রামে ফেরার কোরাস চলছে। পরিবেশ আর অর্থনীতির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে কী চূড়ান্ত পেল্লুলাম সময়। এই নিয়েই কথা হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মাননীয়া গোপা সামন্তের সঙ্গে।

মধুরিমা : আমরা তো এখন একটা অন্যরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তো এই বদলানো সময়ে আপনি কেমন আছেন এবং এই পরিবর্তিত সময়ে আপনি কীভাবে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিচ্ছেন?

গোপা : আমার খুব যে অসুবিধা হচ্ছে তা নয় কারণ আমি একা থাকি ফলে আমাকে বাড়িতে কারোর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে না। তবে সব কেমন গুলিয়ে গেছে বাড়ির কাজের সময়, অফিসের কাজের সময় আর বাড়ির বিনোদনের বা আরামের সময়ের মধ্যে একটা বেশ অদ্ভুত পরিস্থিতি। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা বাড়িটাও আমাদের মেয়েদেরই সামলাতে হচ্ছে যেটা সাধারণ সময়ে আমাদের সহায়করা টাকার বিনিময়ে করে দিত, এবং অফিসটাও সামলাতে হচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে পরিস্থিতিটা খুব জটিল। সামাজিক দূরত্ব আমার জন্য খুব অসুবিধা নয়, কারণ আমি একা থাকাটা বেশ উপভোগ করি। আমার জন্য খুব সমস্যা হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু সেটা তো স্বাভাবিক নয় পরিবারগুলির জন্য।

মধুরিমা : এই সূত্র ধরেই পরের প্রশ্ন যে, আমরা আগে যেমন আমাদের চারিদিকে সবকিছু স্পর্শ করতে পারতাম বা ছুঁয়ে দেখতে পারতাম, এখন সেই জায়গা থেকে একটা অপ্টিকাল বা ভার্চুয়াল স্পেসে চলে

এসেছি যেখানে আমরা সবকিছু দেখতে পারছি, বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার নিজস্ব যাপনটা সেখানে নেই, যাকে বলা হচ্ছে 'নিউ নর্মাল'। এই 'নিউ নর্মাল' বিষয়টি নিয়ে যদি কিছু বলেন।

গোপা : দেখো, পৃথিবীতে আগেও অনেক বড়ো বড়ো পরিবর্তন হয়েছে। টেকনোলজির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সভ্যতা সবকিছু বদলেছে; ফলে বদলটা খুব স্বাভাবিক। তবে এটা খুব স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয় এই কারণে যে এইবারের বদলটার প্রেক্ষাপটটা খুব সুখকর নয়। কারণ অনেক মানুষ খুব খারাপ অবস্থায় পড়েছেন। শুধু শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াও, কাজ চলে যাচ্ছে, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, অন্য জায়গায় আটকে পড়েছে এবং একটা অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে আজকের এই পৃথিবীর রূপটা ভবিষ্যতে কী হবে সেটা হয়তো আমরা এখনই ঠিক করে বলতে পারছি না, বা বুঝতেও পারছি না। কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি যে অবস্থা কখনই আর করোনা-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফেরত যাবে না। একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থায় আমাদের অভ্যস্ত হতেই হবে। এই ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও আবার কিছু দিনের মধ্যে যে একটা নতুন ভাইরাস আসবে না তার কোনও নিশ্চয়তা তো নেই, কারণ জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সেটাও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তার হয়তো প্রভাবটা অন্য ধরনের হবে, সেটা হয়তো অতটা সংক্রামক নাও হতে পারে বা আরও বেশি সংক্রামক হতে পারে। ফলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীটাকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু পরিবারগুলোতে অনেক বদল আসছে, সামাজিক সম্পর্কগুলোতে খুব বদল আসছে, আমরা কেমন যেন একটু সন্দেহপ্রবণ হয়ে যাচ্ছি, বাড়ির বেল বাজলে মনে হচ্ছে "ওরে বাবা কে এল!" বা কেউ এলেই মনে হচ্ছে যে "ওর থেকে আমি কোন ভাইরাস পেলাম না তো?" একটা ভীষণ খারাপ সন্দেহ বাতিক, যেটা কিন্তু 'কিলার'। সামাজিক সম্পর্কগুলোয় বদল হলে তার থেকে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আসবে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে।

মধুরিমা : পরিবেশের কথা যেটা বললেন, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক, পাশাপাশি যেটা একদম প্রাকৃতিক, যেখানে এখন বারবার বলা হচ্ছে যে এই লকডাউনের কারণে প্রকৃতি নিজের ছন্দে ফিরছে, যেমন গঙ্গা স্বচ্ছ হয়ে গেছে, বিহারের গ্রাম থেকে হিমালয় দেখা যাচ্ছে এটা কি আদৌ সত্যি না কি একটা রূপকথা হিসেবে দেখছি, যে এত খারাপের

মধ্যেও এই একটা কিছু ভালো তো হচ্ছে। এই সাময়িক বদলটা থেকে আদৌ আমরা কোন শিক্ষা নিচ্ছি যে পরবর্তীতে আমরা পরিবেশকে কীভাবে বাঁচাতে পারবো বা পরিবেশের প্রতি আরও কীভাবে যত্নশীল হতে পারবো?

গোপা : বিহারের গ্রাম থেকে হিমালয় দেখতে পাচ্ছি বা আকাশ নীল হয়ে গেল এই আনন্দটা খুব সাময়িক। আমরা আবার যেদিন রাস্তায় বেরোব এগুলো আর থাকবে না। আমরা আশা করতে পারতাম যে কিছু পরিবর্তন হবে কিন্তু তার কোন লক্ষণ এখনও পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। পরিবর্তন যদি আনতে হয় তাহলে সেটা খুব ভেবেচিন্তে আনতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে যদি দেখো সারা পৃথিবীতে যে ঘটনাগুলো ঘটছে - ব্রাজিলে এই সুযোগেও আমাজনের জঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে, ভারতবর্ষে খনি এবং শিল্প যেগুলো পরিবেশ দপ্তরের ছাড় পাচ্ছিল না সেগুলোও ক্লিয়ার করে দেওয়া হল, তাহলে তো ধরেই নিতে হয় বরং উল্টোদিকে যাচ্ছি। অর্থনীতিতে গতি ফেরানোর জন্য হয়তো দেখা যাবে অনেক বেশি পরিমাণে পরিবেশ নষ্ট করছি। আমি তো এখনও পর্যন্ত খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব পরিবেশের ওপরে দেখছি না। তাই আমাদের খুব আহ্লাদিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

অনেকে হয়তো বলবেন যে আমি একটু কম আশাবাদী, কিন্তু এটাই ঘটনা। আমরা ধারণযোগ্য উন্নয়নের কথা বলি, যদিও এই ধারণা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই ধরনের অনেক ধারণাই আসে প্রধানত ইউনাইটেড নেশনস বা বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে এবং তার প্রয়োগের টার্গেট রাখা হয় সাধারণভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে। এইসব ভাবনাগুলোর মূলেই একটু সমস্যা আছে। তুমি যদি ধারণযোগ্য উন্নয়নের সংজ্ঞা খেয়াল করে পড়ো দেখবে যে ধারণযোগ্য উন্নয়ন বলতে আমরা যেটা বুঝি বা বলি সেটা খুব জটিল বা প্রব্লেম্যাটিক। সেখানে বলা হচ্ছে মানুষকে বর্তমানে সম্পদের ব্যাবহার কমিয়ে ভবিষ্যতের জন্য রেখে যেতে হবে বা সঞ্চয় করতে হবে। এবার ভাবো কতজন মানুষ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যাবহারে পৌঁছতে পেরেছে? এখনও তো বহু লোক ন্যূনতম সম্পদ ভোগ করতেই পারেনি, তাদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারি কি? তাহলে সেই অসাম্য দুর না করে কী করে

সম্পদের ব্যবহার কমানোর ব্যবস্থা হবে? কার ভবিষ্যৎ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাইছি আমরা? আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা এখানে বলা হয়েছে - মানুষ যে ভুল কাজ করল, তার ফল থেকে সে শিক্ষা নেবে। এবার ভেবে দেখো কাজটা যারা করছে অর্থাৎ যারা সিদ্ধান্ত নিল আর যারা ফল ভোগ করবে— এই দুটো গোষ্ঠী কি এক? ধরো জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রামবাসীদের সরিয়ে খনি বা কারখানা হবে, তো ফলটা কে ভোগ করবে? কোথাও ক্ষমতাশালী লোকদের শহরকে নষ্ট করে, বড়ো বড়ো জনবসতি নষ্ট করে উন্নয়ন হয় না। যেখানে প্রান্তিক লোকজন আছে - আদিবাসী সম্প্রদায় বা গরিব লোকজন - তাদেরকে সরিয়ে উন্নয়ন হয়। তাই যারা সিদ্ধান্ত নিল তারা সেখানে থাকে না, তাদের ওপরে কোন সমস্যা বা প্রভাব পড়বে না! আবার যাদের ওপর প্রভাব পড়বে, তাদের কথা শোনাই হবে না। সেজন্য দেখা যাচ্ছে যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সে যদি ফলটা না ভোগ করে তাহলে সে শিখবে কি করে? ফলটা অন্য জনের ঘাড়েই যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি খুব একটা আশাবাদী নই। বরং যদি দেখা যায় যে গ্রিন পার্টি বা পরিবেশ নিয়ে আন্দোলনটা খুব বড়ো লেভেলে উঠে আসে, তবেই আমরা আশা করতে পারি যে কিছু পরিবর্তন হবে ভবিষ্যতে, তাছাড়া এটা খুব মুশকিল।

মধুরিম : আপনি যে কথাটা বলছিলেন, আমরাও প্রথম থেকেই শুনছি যে বড়োলোকরা প্লেনে করে নিয়ে এসেছে এবং তারপরে এখানে 'গোষ্ঠী সংক্রমণ' শুরু হয়েছে ইত্যাদি। সত্যি প্লেনে করে নিয়ে আসা রোগটা যাদেরকে এফেক্ট করল শুধুমাত্র রোগের মাধ্যমে নয় সার্বিকভাবে, সামাজিক ভাবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই মানুষ গুলোকেই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। এই যে পুরো উলটো যাত্রা শুরু হয়েছে, পরিযায়ীরা শহর থেকে শিকড়ের কাছে বা গ্রামের দিকে ফিরে আসছে। এখন প্রশ্ন হল, যখন এই শ্রমিকরা আবার নিজেদের গ্রামে ফিরে আসছেন তারা কি গ্রামে কর্মসংস্থান পাবেন? গ্রামে কি সেই সমান মর্যাদাটা তারা পাবেন যার জন্য একদিন তাদের শহরে যেতে হয়েছিল?

গোপা : পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত এত ছবি, এত নিউজ কভারেজ, এত ভিডিও দেখছি যে আমাদের পাগল পাগল অবস্থা তাই তো! এখানে একটু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটটা বোঝা দরকার। গ্রাম

থেকে শহরে লোকজন যাবে কাজের জন্য, এটা নতুন না। গ্রামে কাজের সুযোগ নেই এবং শহরে কাজের সুযোগ আছে। এই সুযোগের জন্য গ্রাম থেকে শহরে যাবে লোকজন। এটা চিরকাল ছিল। অনেকদিন আগে ব্যপারটা ছিল যারা যেত গ্রাম থেকে শহরে গরিব হোক বা বড়লোক, এরা মোটামুটি স্থায়ী ভাবে শহরে থেকে যেত। উদার অর্থনীতির যুগে একটা বড় পরিবর্তন এল, সব ধরনের কাজের প্রকৃতিই সাময়িক এবং আউটসোর্স হয়ে গেল। উদারীকরণ এবং বেসরকারিকরণের ফলে নতুন কাজের জন্য প্রচুর শ্রমিকের দরকার হচ্ছিল। গত দু'তিনটে দশকে অনেক নতুন সার্ভিস সেক্টর তৈরি হয়েছে এবং তার জন্য শ্রমিকের চাহিদাও বেড়েছে। দশ-কুড়ি বছর আগে দলে দলে বাড়ির কাজ বা রান্নার কাজ করার জন্য মেয়েদের বা প্রাইভেট সিকিউরিটির কাজ করার জন্য ছেলেদের বিভিন্ন শহরে যাওয়ার ট্রেন্ড কিন্তু ছিল না। এরকম অসংখ্য সার্ভিস সেক্টর আছে এবং এগুলো হচ্ছে সবই অসংগঠিত। এই মানুষগুলোকে আমাদের শহরজীবনে ভীষণ দরকার। কিন্তু মানুষগুলোকে আমরা শহরে ঠিক চাই না। যেমন ধরো, যদি দিল্লির খবর নাও, দেখবে কমনওয়েলথ গেমসের সময় দিল্লি শহরের ভিতরের যে সমস্ত বস্তি বা গরিব লোকদের এলাকাগুলো ছিল পুরোপুরি বার করে দেওয়া হল শহরের বাইরে। সমস্ত শহরেই কিন্তু আবাসন প্রকল্পের বিরাট একটা বাড়বাড়ন্ত হল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল গরিব একালাগুলোকে সরিয়ে বা উচ্ছেদ করে রিয়েল এস্টেট দখল নিতে শুরু করল। এইভাবে গরীবরা পুশব্যাক হতে হতে শহরের বাইরের চলে গেল।

স্থানান্তরের ব্যাপারে আমরা একটা খুব সরল সমীকরণ করি। প্রায়শই বলা হয় কৃষিক্ষেত্রের সমস্যার জন্য গ্রামে লোকে কাজ পাচ্ছে না তাই শহরে যাচ্ছে। ইকুয়েশনটা কিন্তু অত সোজা না। এখন দেখো, যদি বাবার কিছু জমি থাকে বা তিনি কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন, ছেলে ওই কাজটা করতে চাইবে না। কাজটা যদি পাওয়াও যায় সেই জায়গায় তাও। কারণ এই নতুন যুবক সম্প্রদায় গ্রামে থাকতে চায় না। এদেরও একটা বিরাট রকমের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে বা বলা যেতে পারে কনজিউমারিস্ট আকর্ষণ হয়েছে। এটা

আমরা যারা গ্রামে ঘুরে গবেষণা করি তারা জানি, বাইরের থেকে বোঝা যায় না। সেই জন্যই দেখা যাচ্ছে যে এই বিপুল সংখ্যক অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে ছেলেরা (কারণ মেয়েদের তো অত সহজে বাইরে যাওয়া হয় না) দলে দলে শহরমুখী হয়েছে।

মধুরিমা : ঠিকই, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিষয়টা....

গোপা : এই পরিস্থিতিতে যে সমস্যাটা আমরা দেখলাম সেটা অপরিকল্পিত ভাবে তৈরি করা সমস্যা। অনেক কিছু করা যেত যেগুলো আমরা ঠিক ভাবে করে উঠতে পারিনি। যেমন ধরো, লকডাউনের ঘোষণা বিমানের জন্য এক সপ্তাহ আগে করা হয়েছিল কিন্তু ট্রেনের জন্য করা হয়নি। তাহলে লোকজন সংক্রমণ ছড়ানোর আগেই বাড়ি ফিরে যেতে পারত। এর কারণ মনে করা হচ্ছে সরকারের ধারণা ছিল না কত লোক এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য বা দুর দূরান্তে গিয়ে কাজ করে। যদিও এটা আমার ঠিক মনে হয় না যে একটা সরকার এবং তার লোকজন একেবারেই এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন না যে কী পরিমাণ মানুষ পরিযায়ী হিসেবে কাজ করেন। আগে ধরো পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে উত্তর ভারতে শ্রমিকরা কাজে যেত কিন্ত এখন তারা দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে যায় কারণ সেখানে বেতন উত্তরের থেকে বেশি। আবার দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে তারা সেখানকার স্থানীয় শ্রমিকদের থেকে কম বেতন পায়। তাই সেইসব রাজ্যের শ্রমিক অপেক্ষা ঠিকাদাররা এখান থেকে শ্রমিক নিয়ে যেতে বেশি পছন্দ করে। গরিব মানুষও ভাববে, আমি যেখানে দু'পয়সা বেশি পাবো সেখানে আমরা কেন যাব না?

আগের কথায় ফিরে আসি, বলছিলাম না, অনেক কিছুই করা যেত ইচ্ছে থাকলে। ধরো যখন লকডাউন হল, তখনও তো সংক্রমণ অতটা ছড়ায়নি, তাহলে তক্ষুণি শ্রমিক ট্রেন বা বিশেষ ট্রেন চালু করেও শ্রমিকদের ফেরানো যেত। তাছাড়াও ধরো, আমাদের যে 'সোনালি চতুর্ভূজ' যেটা বিজেপি সরকার অটল বিহারী বাজপেয়ির সময় শুরু হয়েছিল, যেটা দিয়ে ভারতের প্রধান চারটে মহানগরকে যোগ করা হয়েছিল, সেই রাস্তাগুলো ভারতবর্ষের কোনও না কোনও পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ে, সেগুলো তো শূন্যে ভাসছে না। যদি ধরা যায় শ্রমিকদের জন্য ট্রেনের বন্দোবস্ত করা গেল না, শ্রমিকরা

হেঁটেই ফিরবে। এই সমস্ত হাইওয়েগুলো যে যে গ্রাম পঞ্চায়েত বা শহর এলাকার মধ্যে পড়বে, সেই সমস্ত স্থানীয় প্রশাসনকে তো বলাই যেত যে তারা যাতে একটা করে সাময়িক বিশ্রামের জায়গা, জল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবারটুকুর ব্যবস্থা করে! টাকাটা কেন্দ্র সরকার দিয়ে দেবে ওই পিএম টু ডিএম মডেলে। সেটুকুতে তো সরকারের অত কিছু খরচ হত না, তাই না! সেটুকুও করা গেল না, বা বলব করা হল না।

আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য দেখতে পেলাম সেদিন। রেলওয়ের ব্যপারে কিছু একটা খোঁজার জন্য আমি গুগল করতে যাচ্ছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমরা যখন গুগল সার্চ করি তখন গুগল অপশন দিতে থাকে তার সার্চ ইতিহাস থেকে। সেখানে আমাকে দেখাল যে ডোনেশন অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে টু পিএম কেয়ারস ফান্ড। এবং সেটার পরিমাণ ১৫১ কোটি টাকা! রেল, সরকারি সংস্থা, সে টাকা দিল পিএম কেয়ারস-এ। কিন্তু সে শ্রমিকদের কোন ভাবেই টিকিটে ভর্তুকি দেবে না। কী বলবো বলো! সত্যি অদ্ভুত লাগে, কী করে এই সিদ্ধান্তগুলো একটা সরকারি সংস্থা নিতে পারে। এটা যেন ইচ্ছে করেই তাদের গুরুত্ব না দেওয়া, এ ছাড়া আর কী হতে পারে!

মধুরিমা : এই শ্রমিকরা যদি আর না ফিরতে চায় তাহলে শহরের মানুষ এবং কারখানা বা ব্যবসার মালিকদের কী হবে তাহলে?

গোপা : যারা ওদের পাত্তা দিচ্ছে না তারা খুব ভালো করে জানে মধুরিমা পেট বড়ো বালাই। ওরা ফেরত আসবে। পাবে না কাজ ওরা, গ্রামে কাজ নেই, এত কাজ কাউকে দিতে পারবে না, কোনও সরকার দিতে পারবে না। সম্ভবই নয়। এমজিএনআরইজিএর কাজ ক'দিন হয়? ক'টা গ্রাম পঞ্চায়েত একশো দিনের কাজ জোগাড় করতে পারে। গড়ে ৫০, ৬০, ৭০ দিন হয়ত। কিন্তু তাতে তো মানুষের সংসার চলবে না। তাই ওদেরকে বেরোতেই হয়। আবার সব ভুলে গিয়ে তারা বেরোবে এবং এটা জেনে গেছি বলেই কিন্তু আমরা ওদের ওপর এত অত্যাচার করতে পারছি।

তোমাকে আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি, ধরো আমরা যখন পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা বলছি তখন আমরা সরকারকে দোষারোপ করছি, রেলকে দোষারোপ করছি এবং কারখানার মালিক বা যারা এই

লোকগুলোকে কাজ দিয়েছে তাদের দোষারোপ করছি। কিন্তু কী জানো তো পুরো পদ্ধতিটা যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা হচ্ছে শ্রমিক ঠিকাদার। এগুলোর একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। গ্রামের গরিব লোক ব্যাঙ্ক থেকে ধার পায় না, মহাজনের কাছ থেকে ধার নেয়। মহাজনের ধারের সুদটা অনেক বেশি। তাই সেখানে অবতার হিসেবে হাজির হয় কিছু মানুষ, যারা আসলে শ্রমিক ঠিকাদার। যারা ধার দেয় কিন্তু শর্ত থাকে। কী শর্ত? "যখন চাষের কাজ থাকবে না তখন তুমি শহরে কাজ করবে"। শ্রমিকরা কিন্তু নিজেরা কাজ খুঁজে নিয়ে শহরে যায় না। গ্রামের ঠিকাদার এই শ্রমিকদের শহরে পৌঁছয়। শহরে ঠিকাদার আছে, যে তাদের কাজে নিয়োগ করছে। ঠিক করছে কোন বাড়ি, কোন কারখানা কোথায় যাবে!

এরা কিন্তু কেউ সারফেসেই আসে নি। আমরা জানিই না যে এরা আছে এবং পুরো ব্যবস্থাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা একমাত্র যারা কাজ করে তারা জানে। এরা কিন্তু ভীষণ ক্ষমতাশালী এবং এদের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্কগুলো খুব এক্সপ্লয়টেটিং। এরা শ্রমিককে যে কাজ দিল তারপর হয়ত ছ'মাস বেতন পাবে না। অনেক জায়গায় কাজ করে কাজের টাকাটা ঠিকাদারের হাত ঘুরে পায়। কাজে যাবার পরে সে ছ'মাস ফেরত আসতে পারবে না। কোন টাকাই দেওয়া হবে না। দেওয়া হলেও তার থেকেই এই ঠিকাদাররা শেয়ার নেবে। আবার অনেক সময় অনেক শ্রমিক ঠিকাদারের হাত দিয়ে বাড়িতে টাকা পাঠায়। তার থেকেও এরা বড় শেয়ার নিয়ে নেয়। ফলে এটা ভীষণ একটা এক্সপ্লয়টেটিভ রিলেশনশিপ। আজকের ভারতবর্ষে কিন্তু আমরা কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছি না। তারা আছে, ভীষণ ভাবে আছে। এবং তারা আবার অপারেট করবে এবং এই পদ্ধতিটাকে চালিয়ে নিয়েই যাবে। গরীব তো যেতে বাধ্য শহরে। তারা এখন হয়তো সাময়িক ধাক্কাটা পেয়েছে, এখন হয়তো যেতে চাইবে না কোনোভাবেই। একান্ত আমার ধারণা। আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। যদি ভুল হয়, আমি খুবই খুশি হব।

মধুরিমা : আপনি যেটা বললেন যে যুবসমাজ গ্রামে থাকতে চায় না। এটা খুব স্বাভাবিক। আমিও, আজকে যদি এখানে একটা চাকরি পাই যেটার বেতন বা সুযোগ সুবিধা অন্যরকম হয় এবং বাইরে যদি বেশি হয়

আমি অবশ্যই বাইরে যাব। এই পদ্ধতিটা বহুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। আমরা সত্যি গ্রাম বা ছোট শহরগুলো ছেড়ে চাকরির জন্য হোক বা আরও বেশি ভালো জীবন যাপনের জন্য হোক বাইরে কোনও একটা কেন্দ্রের দিকে যেতে চেয়েছি সেটা কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই যাই হোক না কেন। ওই বড়ো শহরগুলোই এখন সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অতিমারী থেকে। আপনার কথায় এটা অনেকটা স্পষ্ট, যে বিকেন্দ্রীকরণটা হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু কোনোভাবেই হতে পারে নি। সেই সমস্ত ক্ষমতা রাজধানী কেন্দ্রিক বা বড়ো শহর কেন্দ্রিক হয়ে রয়েছে যেটার একটা আকর্ষণে আমাদের যেতে হচ্ছে। পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই পরিবেশটা অর্থাৎ একটা জায়গায় কুক্ষিগত হয়ে থাকার চাইতে বেরিয়ে আসার অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণের কোনও আশা বা সম্ভবনা কি রয়েছে?

গোপা : বলাটা খুব মুশকিল! সেটাও ওই পরিবেশের মতোনই, যার ভবিষ্যৎ আমরা ঠিক জানি না। তাহলে তোমাকে একটু প্রেক্ষাপটটা বলতে হয় এই যে বড়ো শহর বেড়ে যাচ্ছে সেই চিন্তাটা অনেকদিন আগেই ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল এবং তারপর ন্যাশনাল কমিশন অফ আরবানাইজেশন বলে একটা কমিশন তৈরি হয়েছিল যারা রিপোর্ট দিয়েছিল১৯৮৮ সালে। রিপোর্ট বলেছিল যে, এই ভাবে বড়ো শহর গুলোকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। ছোট শহরগুলোর দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারপরেও কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। পরিকাঠামো উন্নয়নই বল আর পরিষেবার উন্নয়ন কোনটাই ছোটো শহরে তেমন করে হয়নি। তুমি একটা সহজ জিনিস দেখো, কল্যাণী তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল কলকাতার অলটারনেটিভ হিসেবে, কিন্তু হয়নি। গোটা পশ্চিমবঙ্গে সবকিছুর জন্য লোককে এখনও কলকাতায় ছুটতে হবে। আর কোথাও তেমন কিছু নেই। এবং এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের চিত্র নয়, আরও অনেক রাজ্যের চিত্র। আবার এটা শুধু আমাদের দেশের চিত্র নয় পৃথিবীর অনেক দেশের চিত্র।

লন্ডন শহরে গ্রিন বেল্ট তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে শহরটাকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য, সেটার বাইরে শহর বাড়তেই থেকেছে, ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে। ফ্রান্সে প্যারিস, পুরো দেশটার মধ্যে একটাই প্রতিনিধিত্ব মূলক শহর। বাকি সব ছোটখাটো শহরগুলো তেমন ভাবে

বেড়ে উঠছেই না, কারণ পরিকল্পিত ভাবে প্যারিসের বৃদ্ধি থামানো হয়নি। বরং সেটাকে আরো বাড়ানোর জন্য 'গ্রঁ প্যারী' নামের একটা প্রকল্প নিয়েছে। তাহলে তো সেই কেন্দ্রীকরণই হচ্ছে। যে কারণে গ্রামের ছেলে গ্রামে না থেকে শহরে যেতে চাইবে, ছোটো শহর থেকে বড়ো শহরেও লোকজন একই কারণে যেতে চাইবে। সেজন্য ভালো পরিকাঠামো আর ভালো পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণ খুব দরকার। যে কোনও অসুস্থতা হলে আমাকে কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যেতে হবে, একটা ভালো নাটক দেখতে ইচ্ছে হয়েছে, আমাকে কলকাতা যেতে হবে। একটা ভালো লেকচার শোনার ইচ্ছে হয়েছে, আমাকে কলকাতা যেতে হবে। আমি কলকাতার বাইরে কিছুই পাই না তেমন। এর ফলে কী হয়েছে অন্য ছোটো শহরে যাদের ক্ষমতা আছে অর্থাৎ আপার মিডল ক্লাস, তারা কলকাতায় একটা বাড়ি কিনে রাখছে। এতে কলকাতাই বাড়তে থাকছে। অন্য শহর তো তেমন ভাবে বাড়ছে না, বা বাড়লেও গ্রাম থেকে আসা লোকজনদের নিয়ে বাড়ছে। এই একটা শহরকেই বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ট্রেন্ডটাকে পরিবর্তন করতেই হবে। তা নাহলে একটু মুশকিলই হওয়ার কথা।

মধুরিমা : আপনার কথা থেকে আমার মনে হচ্ছে যে গবেষণা বিষয়টার একটা অন্য রকম সামাজিক গুরুত্ব তৈরি হচ্ছে। কারণ শুধু মাত্র তত্ত্বগত গবেষণা হল, বা কোনও কাম্য একটা ধারণাকে নিয়ে গবেষণা হল এবং সেটা অবশেষে ফাইল বন্দি অবস্থাতেই পড়ে রইল, তাতে কী লাভ! এখন আমার খুব মনে হচ্ছে যে মাঠে নেমে কাজ করার প্রয়োজন এসেছে। মাঠে নেমে বলতে এমন একটা গবেষণা, এমন একটা কাজ যেটা শুধু মাত্র ফাইলবন্দি হবে না। যেটার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকবে মানুষের জীবনের ওপর। রিসার্চ এবং পলিসি মেকিং এই দু'টোর মধ্যে দুরত্ব বরাবর ছিল বা এখনও আমরা দেখতে পাই। সেই ফাঁকটাকে আরও ছোটো করা, দুরত্বটাকে কমানোর প্রয়োজন কি নেই যাতে মানুষ সরাসরি গবেষণার প্রভাবকে নিজেদের জীবনে অনুভব করতে পারবে?

গোপা : গবেষণার দু'টো দিক আছে। কিছু গবেষণা হচ্ছে মৌলিক। সেই মৌলিক গবেষণাগুলোকেও আমরা অবহেলা করতে পারি না। কারণ সেটা যদি না হয়, তাহলে তুমি যে ব্যবহারিক গবেষণার কথা বলছ

সেটা বেশি দূর এগোতে পারবে না। মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন সব সময় ছিল, থাকবেও। এখনকার পৃথিবীতে গবেষণার একটা পলিসি ওরিয়েন্টেড বা ব্যবহারিক ট্রেন্ড হয়েছে। যেমন ধরো, কেউ যদি মৌলিক কোন রিসার্চের একটা প্রস্তাব দেয় আর কেউ যদি বলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী হবে এবং হতে পারে এটা নিয়ে আমি গবেষণা করতে চাই তাহলে দ্বিতীয় প্রস্তাবের ফান্ড পাওয়ার সুযোগ বেশি। ফলে ব্যবহারিক দিকে চলে যাচ্ছে গবেষণাগুলোর ট্রেন্ড। কিন্তু মুশকিলের জায়গাটা কোথায় জানো, ব্যবহারিক গবেষণা যারা করলেন, আর পলিসি যারা করবেন তারা যে সেই গবেষকদের কথা শুনবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এখানে তো একটা রাজনৈতিক অর্থনীতির খেলা আছে। ধরো ভারতবর্ষে অনেক অর্থনীতিবিদ রয়েছেন। কোন অর্থনীতিবিদের কথা শোনা হবে আর কোন অর্থনীতিবিদের কথা শোনা হবে না সেটা কে ঠিক করবে? সেটা তো সরকার ঠিক করবে। ফলে যদি এরকম কেউ থেকেও থাকেন যিনি খুব ভালো একটা গবেষণা করেছেন, একটা কিছু দিশা দেখাতে পারবেন আমাদের, তিনি যদি ঠিক সরকারের লাইনে না থাকেন বা পছন্দের লোক না হন, তাহলে তো তিনি ওয়েলকামড নন। এই জন্য গবেষণাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ ফান্ডিং কীসে দেওয়া হবে এগুলো রাজনৈতিক অর্থনীতির, আন্তর্জাতিক এজেন্ডা এবং কর্পোরেট প্রভাবিত সিদ্ধান্ত। আমরা ধরে নিতে পারি না যে বিজ্ঞানটা পলিটিক্সের বাইরে। মানুষ ব্যবহারিক গবেষণা চিরকাল করেছে, এখনও করছে কিন্তু ওই যে তুমি বলছ গ্যাপটা পলিসি মেকিং এর সঙ্গে থাকছে সেটা সহজে যাবে বলে আমার মনে হয় না।

মধুরিমা : নিউ-নরম্যালের কথায় ফিরে এসে বলা যায় যে এখন আমরা অনলাইনে ক্লাস করছি। দীর্ঘদিন ধরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সবই বন্ধ রয়েছে। টিউশনে যারা যেত তাও বন্ধ রয়েছে। ফলে এখন ভার্চুয়াল ক্লাস করতে হচ্ছে অনলাইনে। এর জন্য স্মার্ট ফোন চাই, নেট প্যাক চাই। অনেকেই বলছেন শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন করে শ্রেণি বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। একটা বড়ো অংশের পড়ুয়াদের কাছে না রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা না আছে স্মার্ট ফোন। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে একদল পড়ুয়া ইন্টারনেটের সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে শিক্ষায় তাদের

মতো করে এগিয়ে যাচ্ছে আর একদল সম্পূর্ণ পিছনে পড়ে থাকছে। যে দূরত্বটা ছিলই সেটা আরও চওড়া হয়ে গেল। সেটা যে কী ভাবে সঙ্কীর্ণ হবে! এটা কি আদৌ সম্ভব যে ভারতবর্ষের মতো একটা দেশে যেখানে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে, যে সুযোগ সুবিধাটাই অধিকাংশ মানুষের কাছে নেই। এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু বলেন...

গোপা : এক্ষেত্রে দেখ যে অনলাইন ক্লাস চালু হল তাতে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যোগ দিতে পারছে না। তাদের হাতে সুযোগ নেই অনলাইন ক্লাসে যোগ দেওয়ার। এতে একটা বড় ডিজিটাল ডিভাইড তৈরি হচ্ছে। তবে এই ডিজিটাল লার্নিং দিয়েই যে আমরা পরীক্ষায় বসতে দিতে বলবো এটা বোধহয় সম্ভব নয়। এখনও পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটুকু আলোচনা হয়েছে বলে আমি শুনেছি যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন ক্লাস করতে পারল না তাদেরকে আবার বিশ্ববিদ্যালয় খুললে ক্লাস নিতে হবে। তখন সোস্যাল ডিসট্যান্সিং মেনেই ক্লাস নিতে হবে, তাদের সংখ্যাটাও তো কম হবে। সেই পড়ুয়াদের আবার আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাস নিয়ে তারপরে পরীক্ষায় বসাতে হবে।

অনলাইন ব্যবস্থাটা কখনই ফিজিক্যাল ক্লাসরুমের বিকল্প হতে পারে না। এটা একটা একান্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে দেখলে ঠিক আছে কিন্তু এই থেকে যে ডিজিটালের চাপটা শিক্ষা ব্যবস্থায় আসবে না সেটা বলা যাচ্ছে না। পাবলিক ইন্সটিটিউশনগুলো যদি ডিজিটাল ব্যবস্থাকে একটুও জায়গা না ছাড়ে তাহলে হয়তো সেই পরিসরটায় প্রাইভেট ইন্সটিটিউশনগুলো চলে আসবে। কিন্তু পাবলিক ইন্সটিটিউশনগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের কাছে যে শিক্ষার্থীরা এসে পৌঁছয় তারা ওই বছরে কয়েক লক্ষ টাকা ফি দেওয়া প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী নয়। তাদের অনেকেরই আর্থিক ক্ষমতা নেই। যাদের নেই তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়কেই দায়িত্ব নিয়ে মোবাইল ফোন, ডেটা প্যাকেজ এগুলো দিতে হবে। কিন্তু একবারে ডিজিটালে যাবই না বললে আমরা পারবো না। বরং ভাবতে হবে যে যারা এই সুবিধাগুলো পাবে না তাদের কীভাবে আমরা ফেসিলিটেট করব। কারণ এমনিতে তুমি নিজেই তো দেখছ পাবলিক এডুকেশন সিস্টেম থেকে তো একবারে প্রাইভেটে নিয়ে যাবার দিকে বৃহত্তর

প্রচেষ্টা চলছে। এবং সেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কী লাভ ভাবো, তাদের তো তেমন আর কোন খরচই থাকবে না, মাঝে থেকে পুরোটাই লাভ। তবে আমি আবারও বলব, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচানোর একটা বৃহত্তর আন্দোলন আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়ের মধ্যেই পড়ে।

মধুরিমা : করোনা বা লকডাউন পরিস্থিতিতে ঘরের দায়িত্বগুলো মেয়েদের ওপরে অনেকটা বেড়ে গেছে কারণ তাদের কাজের সহায়করা আসতে পারছে না। তথ্য বলছে এই সময়ে মেয়েদের ওপরে গার্হস্থ্য হিংসা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। বিভিন্ন রকমের লিঙ্গ বৈষম্য মূলক জোকস সামাজিক গণমাধ্যমে চলেই। এখন অনেক বাড়বাড়ন্ত হয়েছে লকডাউন চলাকালীন সময়ে। এই গোটা বিষয়টা নিয়ে, বিশেষ করে মেয়েদের ওপর সমস্যাটা নিয়ে যদি আপনি একটু বলেন।

গোপা : আমরা ভাবছি যে বিপর্যয়ের সময় মানুষের ব্যবহার খুব মানবিক হবে, তারা কেউ খারাপ ব্যবহার করবে না! কমলা ভাসিন একদিন বলছিলেন যে যখন একটা বিপর্যয় বা খারাপ সময় আসে, তখন যে মানুষের মনের মধ্যে যেটা বেশি আছে, ভালো দিক বা খারাপ দিক সেটাই কিউমুলেটিভ হয়ে বেশি করে প্রকাশ পায়। যারা ভালো তাদের ভালোত্বটা বেরিয়ে আসবে, যারা খারাপ তাদের খারাপটাই বেরিয়ে আসবে। এখন দেখো না ভারতবর্ষে এত হেট স্পীচ, এত হিংস্র মন্তব্য, সোশ্যাল মিডিয়াতে এত বিষ আবার তাদের পাশাপাশি অন্য দিকে কত সংবেদনশীল মানুষ যারা এই শ্রমিকদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে রাস্তায় রাস্তায় তাদের খাবারের ব্যবস্থা করছে। শুধু এনজিও নয়, কত সাধারণ মানুষও চেষ্টা করছে তাদের মতো করে। কত নতুন যুবা দল তৈরি হয়েছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, ওরা একদম ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের খাইয়ে বাঁচানোর জন্য। ভালোটাও তো অনেক মানুষের বেরিয়ে আসছে আবার যারা খারাপ তাদের খারাপটা।

এবার আসি পরিবারের অন্দরের কথায়, মেয়েদের কথায়। এই কোভিডের সময় মেয়েদের কথা ভাবতে গেলে আমাদের মেয়েদের

মধ্যে যে নানান গোষ্ঠী তাদের কথা আলাদা করে ভাবতে হবে, 'মেয়েদের কথা' বলে ইন জেনারেল কিছু হয় না। আমি এই আলোচনায় মেয়েদের তিনটে গ্রুপের কথা ধরব। একটা মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত মেয়েরা যাদের বাড়ি বসে অনলাইনে কাজ করতে হচ্ছে। একদল আছে যারা হচ্ছে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের কিন্তু তারা গৃহবধূ, বাইরের কাজ করেন না। আর একটা হচ্ছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা গরিব পরিবারের মেয়েরা। এবার যারা কাজ করে, অনলাইনে তাদের অফিসের কাজগুলো করে যেতে হচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ির কাজও সামলাতে হচ্ছে। আমার একজন বন্ধু আছে যে একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। ওকে এর মধ্যে অনলাইনে ক্লাস নিতে হয়েছে, অনলাইনে অ্যাডমিশন করাতে হয়েছে, অনলাইনে অ্যাডমিশনের জন্য ইন্টারভিউ নিতে হয়েছে। ছেলের ক্লাসগুলোও টিচাররা সঁপে দিয়েছে বাবা-মা কে। এবার বাবা মা বললেও তো এটা মায়ের ঘাড়েই আসে সেটা জানো। ভারতবর্ষে গৃহকাজ পুরুষরা করেন না। দু'চারজন সংবেদনশীল পুরুষমানুষ আছেন, যারা একটু সাহায্য করে দেন, অনেক সময় চা করে খাওয়ান, দু'দিন রান্না করে খাওয়ান। কিন্তু কেউ একজন শখ করে দু'দিন তোমাকে সাহায্য করে দিচ্ছে আর কেউ একজন মাথার ওপরে সংসারটা নিয়ে দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে এ দু'টো এক জিনিস নয়। এর মধ্যে বিরাট তফাত। স্বাভাবিক অবস্থায় মেয়েদের স্বস্তির জায়গা ছিল যে ওরা অন্তত কয়েকজনকে পয়সা দিয়ে বাড়ির কাজটা করিয়ে নিতে পারত। এখন সেটাও নেই।

আমাদের সব ধরনের সম্পর্কেই একটা 'breething space' বা নিঃশ্বাস নেবার জায়গা লাগে। স্বাভাবিক জীবনে এটা ছিল, এখন সেই একটু দূরত্বও পাওয়া যাচ্ছে না। যে মেয়েরা কাজ বা চাকরি করে তাদের একটা বাইরের জগত ছিল, তাদের সেই বেরোনোর সুযোগটা গেছে। আবার যারা মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ অর্থাৎ বাইরের কাজ করেন না তারা ঘরে থাকলেও নিজের মতো দিনটা পেত। সেই নিজস্ব জগতটাও চলে গেছে, এটা কিন্তু অনেকের কাছে খুব কষ্টকর। অনেকটা সময় একসঙ্গে থাকতে গিয়ে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেড়ে যাচ্ছে। হয়তো এরকমও হতে পারে যে

লকডাউন-পরবর্তী সময়ে ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ল। আবার উলটোদিকে এমনও তো হতে পারে, যে বিয়েটা ভাঙবো-ভাঙবো অবস্থায় ছিল, হঠাৎ করে তারা নতুন করে ভালোবাসা অনুভব করল এবং ঠিক করল যে তারা বিয়েটা ভাঙবে না। হয়তো লকডাউনে অনেক বিয়ে জোড়াও লেগে যেতে পারে, ভাল আশা করতে দোষ কোথায়।

গরিব মেয়েদের ভোগান্তি বেড়েছে খুব বেশি। অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের বেশিরভাগই সঙ্গে পরিবার নিয়ে যেতে পারে না। যারা একটু বেশি রোজগার করে তারা হয়তো পরিবার নিয়ে যাওয়ার সাহস করে। অধিকাংশর পরিবার গ্রামেই থাকে এবং তারা কোনও মতে একটা ছোটো ঘর ভাড়া নিয়ে ১০-১২ জন করে থেকে যায়। কারণ বড়ো বড়ো শহরগুলোর বস্তির একটা ছোটো ঘরেও অনেক খরচ। এবার এই বাড়ির মেয়েগুলোর কথা তুমি ভাবো! তাদের পুরুষ মানুষগুলো আটকে, কোথাও বন্দি হয়ে আছে, তাদের রোজগার নেই, টাকা পাঠাতে পারছে না। এদিকে এদের সংসারে হয়তো বাচ্চা আছে, বুড়ো আছে এবং তাদেরকে সংসারটা টানতে হচ্ছে। সংসারটা টানতে হবে কিন্তু কোন পয়সা নেই। তাদের অবস্থাটা তুমি ভাবো! এই ক্ষেত্রে পুরুষের থেকেও মেয়েটার চাপ কিন্তু বহুগুণ বেশি। তাকে খাবার তুলে দিতে হবে পরিবারের প্রত্যেকের মুখে!

ফলে কোনও বিপর্যয়ই ছেলেদের আর মেয়েদের ওপর একইভাবে প্রভাব ফেলে না। কোভিডও সেটাই আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। কিশোরীদের ওপরও সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির আর্থিক পরিস্থিতি যখন খারাপ হবে তখন মেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে, মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হবে। সেগুলো ইতিমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছে আমাদের দেশে।

আর একটা নতুন ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ উঠে এসেছে গেটেড কমিউনিটি বা আবাসনগুলোতে, যাদের পোষাকি নাম Resident Welfare Association (RWA)। তারা কোনভাবেই কোনও কাজের লোককে ওই গেটের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। যারা এই আবাসন গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা পুরুষ, তাদের ধারণা নেই যে

এটা মেয়েদের জীবনে কী প্রভাব ফেলছে। অতিমারিকে কাজে লাগিয়ে অনেক ধরনের কন্ট্রোলিং এজেন্ট সমাজে উঠে আসছে এবং সেগুলোর প্রভাবও কিছু কম নয়।

মধুরিমা : আপনি বারেবারেই আপনার বেশ কিছু লেখাতে বলেছেন যে একটা কমিউনিটি যখন তৈরি হচ্ছে এবং যখন কোন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সার্বিকভাবে, তখন তাদের মধ্যে থেকে একটা আন্দোলন উঠে এলেও আসতে পারে যেটা হয়তো একটা বড়ো সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। এবার আমাদের এখানে এতো অসংগঠিত, ছোটো ছোটো ক্ষেত্র, যেগুলোর জন্য কোন আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধতে পারে না। মানুষের ক্ষোভ আছে, যেখানে শ্রমিকরা চায় তাদের নিয়ে কেউ কথা বলুক কিন্তু যেহেতু কোনও শ্রমিক সংগঠন নেই সেইজন্য আন্দোলনগুলো দানা বাঁধতে পারছেনা। এইবার এই পরিযায়ী শ্রমিকদের আমরা যদি একটা কমিউনিটি হিসেবে দেখি এবং এদের যে সমস্যায় পড়তে হয়েছে সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে এই গোটা বিষয়টা কি কোথাও রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে পরবর্তীকালে?

গোপা : আমি সেটা বুঝতে পারছি না প্রভাব পড়বে কি না কিন্তু একটা কথা বলতে পারি যে যদি আমরা কিছু বদল চাই তাহলে কিন্তু রাজনীতিতে সরাসরি আসতে হবে শুধু মাঠে আন্দোলন করে কিছু হবে না। তুমি ক'টার মুভমেন্ট করবে? ধরো তুমি এনারসি-র বিরুদ্ধে মুভমেন্ট করছ তখনই আরো অনেক অন্যায় বিল পাশ হল কিন্তু তুমি এনআরসি নিয়ে ব্যস্ত বলে শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন বা পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন মিস করে গেলে। সাধারণ মানুষ তো সবসময় আন্দোলনে নামতে পারবে না বা অংশ নিতে পারবে না। আর আন্দোলন বড় মাপের না হলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না, সরকার অবধি পৌঁছবে না। ফলে আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দখলটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা কিছু বদল চাই তাহলে বদলটা রাজনীতিতেও আনতে হবে আর তা না হলে বাইরে থেকে এককভাবে বড়সড় পরিবর্তন ঘটাতে পারবো না। ফলে ওই ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে, বদল চাইলেও ক্ষমতার কেন্দ্রে গিয়ে বদলাতে হবে। বাইরের থেকে

বদলানোর জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু বদলটা আনা কঠিন। তা বলে এটাও বলা যায় না যে আন্দোলনগুলোর কোন গুরুত্ব নেই, কারণ আন্দোলন থেকেই তো নতুন রাজনীতির দিশা আসবে। তাই সামাজিক আন্দোলনের তো দরকার আছেই। যেমন ধরো কৃষকদের খারাপ অবস্থা তো চলছিলই, কিন্তু যতক্ষণে ওরা দলে দলে হেঁটে না বেরোল কোন কাজ হল না। আবার সামাজিক গণমাধ্যম দ্বারা খুব বেশি পরিবর্তন আনা যায় না, শারীরিক আন্দোলনের খুব দরকার।